GE Philosophy

Fundamentals of Indian philosophy.

1. দর্শনের প্রকার
2. চার্বাক দর্শন
3. বৌদ্ধ দর্শন
4. সাংখ্য দর্শন
5. যোগ দর্শন
6. ন্যায় দর্শন
7. বৈশেষিক দর্শন

1) ভারতীয় দর্শনের চারটি পুরুষার্থের ব্যাখ্যা করো। ⑥ VIP

A- পুরুষার্থ : ভারতীয় দর্শনে সর্বোচ্চ উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যকে বলা হয় পুরুষার্থ। পুরুষ অর্থাৎ ব্যক্তি যা কামনা করে তাকেই বলা হয় পুরুষার্থ। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারটিকে বলা হয় পুরুষার্থ। বিভিন্ন মানুষের প্রকৃতি আলাদা আলাদা হওয়ার জন্য, একজনের কাছে যা প্রধান লক্ষ্য অন্যজনের কাছে তা প্রধান লক্ষ্য নাও হতে পারে। একজন হয়তো অর্থকেই প্রধান লক্ষ্য মনে করে, অপর একজন হয়তো মোক্ষকেই জীবনের প্রধান লক্ষ্য বলে মনে করে। মানুষের প্রকৃতির পার্থক্য অনুসারে চার রকমের পুরুষার্থের কথা বলা হয়েছে। এই চারটি পুরুষার্থ পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। চারটি পুরুষার্থকে নিম্নে আলোচনা করা হলো —

ধর্ম :- ধৃ ধাতু থেকে ধর্ম কথাটির উৎপত্তি হয়েছে। ধৃ মানে ধারণ করা। অর্থাৎ ধর্ম হল তাই যা ধারণ করে। আবার ধর্ম বলতে তাকেই বোঝানো হয় যার থেকে পার্থিব ও অপার্থিব উভয় সম্পদ পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে যজ্ঞকর্মের অর্থে 'ধর্ম' কথাটি ব্যবহৃত হত। কিন্তু পরে যজ্ঞ এবং আশ্রমোচিত কর্তব্য কর্মরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। জৈমিনির মীমাংসা সূত্রে বলা হয়েছে, বিধি বচনের দ্বারা জীবনের যে উৎকর্ষ লক্ষ্যের দিকে মানুষ অগ্রসর হতে উদ্বুদ্ধ হয় এবং যার দ্বারা মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ কল্যাণ সাধিত হয় তাই হলো ধর্ম। ভারতীয় মনীষীদের মতে সকল জীবের মধ্যে মানুষ কেবল বুদ্ধিতেই শ্রেষ্ঠ নয়, মানুষের শ্রেষ্ঠতা তার ধর্মবুদ্ধিতে। ধর্মই মানুষের অতিরিক্ত গুণ। ধর্ম পরবর্তী জীবনে মঙ্গলদান করে এবং বৈদিক ক্রিয়াগুলি ধর্ম অর্জনের প্রধান মার্গ। পুরাণে মৃত্যুর দেবতা যমকে ধর্মরাজ বলা হয়েছে। যার কাজ হলো মানুষের কৃতকর্ম অনুযায়ী পরলোকে পুরস্কার বা শাস্তি দেওয়া।

(ii) অর্থ :- ভোগের উপায় হিসাবে 'অর্থ' হলো মানব জীবনের দ্বিতীয় পুরুষার্থ। মানুষ সমাজ জীবনের অস্তিত্ব ও অর্থ উপার্জনের জন্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মানুষ তার প্রয়োজনীয় সবকিছু নিজে উৎপাদন করতে পারে না। সেজন্য সে নিজের উৎপাদিত বিষয়ের বিনিময়ে অর্থ সংগ্রহ করে এবং অপরের উৎপাদিত বস্তু বা বিষয় সেই অর্থের সাহায্যে কিনে নেয়। এইজন্য সমাজ জীবনে বসবাসের জন্য অর্থ উপার্জন একটি বিশেষ কর্তব্য বা লক্ষ্য। ভারতীয় দর্শনের অন্যতম অনুশাসন হল - সৎ উপায়ে অর্থ উপার্জন। লোভ ও মোহের বশবর্তী হয়ে অর্থ উপার্জন করা উচিত নয়।

(iii) কাম :- ভারতীয় দর্শনে কাম বা ইন্দ্রিয় সুখভোগকে জীবনের একটি পুরুষার্থ বলে স্বীকার করা হয়েছে। ইন্দ্রিয় অনুভূতি থেকে উৎপন্ন সুখটিকে বলা হয় কাম। কাম্য বস্তুকে পাওয়া ও তাকে ভোগ করা জীবাত্মার জীবনের মূল লক্ষ্য। এই কাম বা সুখভোগের উপায় হিসাবে অর্থ অপরিহার্য। আমরা যা কিছু কামনা করি তার সবকিছুই কাম্য নয়। পীড়িত ব্যক্তি একটি বিশেষ খাদ্য খেতে চাইতে পারে, কিন্তু তার পীড়ার কথা চিন্তা করে তাকে ঐ খাদ্য দেওয়া উচিত নয়। কাজেই 'কাম' আমাদের কামনার বিষয় হলেও তা যে সর্বদাই কাম্য তা নয়।

(iv) মোক্ষ :- মোক্ষ হলো সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ। দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিকে বলা হয় মোক্ষ। অর্থাৎ দুঃখ থেকে চিরমুক্তি হলো মোক্ষ। পরিপূর্ণ আত্মজ্ঞান লাভ করলেই জীবের মোক্ষলাভ হয় ও সে পুনরায় আর জন্ম-জন্মান্তরের জালে আবদ্ধ হয় না। প্রাচীন ভারতে মোক্ষ লাভের উপায় হিসাবে তিনটি মার্গের উল্লেখ করা হয়। যথা - জ্ঞান,

ধর্ম ও উক্তি। চার্বাক দার্শনিকগন ছাড়া অন্যান্য সব ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়ই বেদকে প্রমাণ ও একমাত্র যথার্থ স্বতঃপ্রমাণ হিসাবে স্বীকার করেছেন।

২) প্রকৃতির অস্তিত্ব বিষয়ক যুক্তিগুলি লেখ।

উঃ- প্রকৃতি যেহেতু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, সেহেতু প্রকৃতির অস্তিত্ব যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। প্রকৃতির অস্তিত্বসাধক যুক্তিগুলিকে ঈশ্বরকৃষ্ণ তার সাংখ্যকারিকার সূত্র আকারে প্রকাশ করেছেন।
ভেদানাং পরিমাণাৎ সমন্বয়াৎ শক্তিতঃ প্রবৃত্তেশ্চ।
কারণ কার্য বিভাগাৎ অবিভাগাৎ বৈশ্বরূপস্য।
এই সূত্রগুলিকে নিম্নে বিশ্লেষণ করা হলো —

(i) ভেদানাং পরিমাণাৎ :- এই জগতে অনেক বস্তু আছে এই সব বস্তু ভেদযুক্ত বা বিচ্ছিন্ন। এইসব বিভিন্ন বস্তু সীমিত এবং পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। এইসব পরিমিত (সীমিত) বস্তু এক অপরিমিত (অসীমিত) কারণ থেকে উদ্ভূত হতে পারে। কাজেই এইসব সীমিত বস্তুর কারণ রূপে কোন অসীম ও স্বতন্ত্র কারণ থাকবে। এই সেই অসীম কারণ রূপে প্রকৃতির অস্তিত্ব স্বীকার করতে হবে।

(ii) সমন্বয়াৎ :- জগতের বস্তুগুলি পরস্পর থেকে ভিন্ন হলেও কয়েকটি বিষয়ে তাদের মধ্যে সমতা আছে। প্রতিটি বস্তুই মনে সুখ, দুঃখ, ও বিষাদ সৃষ্টি করতে পারে। সত্ত্বগুন সুখজনক, রজোগুন দুঃখজনক এবং তমোগুন বিষাদজনক। বস্তু মাত্রই সুখ দুঃখ ও বিষাদ উৎপাদক হওয়ায় তাদের

প্রত্যেকের মধ্যেই .... । কাজেই জগতের মূলে এমন কোন কারন অবশ্যই আছে যা ত্রিগুণাত্মক - সুখ দুঃখ ও বিষাদ - উৎপাদক । এই মূল কারনই হল প্রকৃতি ।

(iii) শক্তিতঃ প্রবৃত্তেশ্চ :- সৎকার্যবাদ অনুসারে সৃষ্ট বস্তু-মাত্রই তার উপাদান কারনে অব্যক্ত অবস্থায় থাকে । তাই এই বৈচিত্র্যময় জগৎ সৃষ্টির পূর্বে নিশ্চই কোন এক অব্যক্ত কারনে সুপ্ত অবস্থায় ছিল । আবার এই জগতের অব্যক্ত কারনকে নিশ্চই এই জগৎ সৃষ্টি করার মত ক্ষমতা সম্পন্ন বা এই জগতের .... হওয়ার মত ক্ষমতা বিশিষ্ট হতে হবে। যে অব্যক্ত ব শক্তির এই বৈচিত্র্যময় জগতের আবির্ভাব হবার যোগ্যতা যার আছে, তাই হলো প্রকৃতি।

(iv) কারনকার্যবিভাগাৎ :- কার্য ও কারনের মধ্যে ভেদ দেখা যায় । সমস্ত কার্যই উৎপন্ন হওয়ার পূর্বে অব্যক্তভাবে তাদের উপাদান কারনে বিদ্যমান থাকে তাই এই জগৎরূপ কার্য যে উপাদান কারনের মধ্যে অব্যক্তভাবে বিদ্যমান ছিল সেই কারনই হলো প্রকৃতি।

(v) অবিভাগাৎ বৈশ্বরূপ্যস্য :- যে কোন কার্য তার উপাদান কারন থেকেই উৎপন্ন হয় এবং বিনাশ প্রাপ্ত হলে উপাদান কারনেই বিলীন হয়ে যায়। অভিজ্ঞতায় আমরা যেসব সসীম সসীম বস্তু দেখতে পাই সেইগুলি সসীম সসীম কারন থেকে উদ্ভূত এবং ঐই সব কারন আবার অন্য কারন থেকে উদ্ভূত। এভাবে আমরা অসীম মূল কারনে এসে পৌঁছাই। তাই আমরা এক অসীম নিত্য সর্বব্যাপক ; ... নিরবয়ব ; অবিনাশী ও .... কারন পাই যা

এই জগতের মূল কারণ। এই কারণই হলো প্রকৃতি। এই প্রকৃতি থেকেই জগতের উৎপত্তি, আবার প্রলয়ে সমস্ত জন্য প্রকৃতিতেই বিনাশপ্রাপ্ত হয়। অতএব যাকে আমরা বিনাশ বলছি তা অব্যক্তে বিলীন হওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। যেমন - ঘটনা বিনাশের সময় মাটিতে বিলীন হয়ে যায়।

3) নির্বিকল্পক ও সবিকল্পক প্রত্যক্ষের মধ্যে পার্থক্য লেখ। V.V.I.

A. লৌকিক প্রত্যক্ষ তিনপ্রকার। যথা - নির্বিকল্পক, সবিকল্পক, ও প্রত্যভিজ্ঞা। নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ ও সবিকল্পক হলো, - প্রত্যক্ষের দুটি ভিন্ন স্তর। এদের মধ্যে যে পার্থক্য গুলি আছে তা নিম্নে আলোচনা করা হলো।

(i) নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ হলো 'নিষ্প্রকারকং জ্ঞানং নির্বিকল্পকম্'। অর্থাৎ যে প্রত্যক্ষে বস্তুর জ্ঞান হয় কিন্তু বস্তুর প্রকার বা বিশেষণ বা নাম সম্বন্ধে কোন জ্ঞান হয় না, তাকে - নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ বলে।

অপরদিকে সবিকল্পক প্রত্যক্ষ হলো — "সপ্রকারকং জ্ঞানং সবিকল্পকম্"। অর্থাৎ প্রকার বা বিশেষণ বিশিষ্ট বস্তুকে বিষয় করে যে জ্ঞান হয় তাকে সবিকল্পক প্রত্যক্ষ বলে।

(ii) নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ হলো প্রত্যক্ষ জ্ঞানের প্রাথমিক স্তর কেননা এতে কেবলমাত্র বিষয়টি নিজ আকারে প্রতিফলিত হয় এবং কোন ধর্ম আরোপের সুযোগ থাকে না।

অপরদিকে সবিকল্পক প্রত্যক্ষ হলো প্রত্যক্ষ জ্ঞানের

দ্বিতীয় স্তর বা পরিণতি স্তর। এক্ষেত্রে ভ্রান্তি আরোপের সুযোগ থাকে।

(iii) নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষে বিশেষ্য-বিশেষণ সম্বন্ধ থাকে না। তাই নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

অপরদিকে সবিকল্পক প্রত্যক্ষ জ্ঞানে বিশেষ্য-বিশেষণ সম্বন্ধ থাকে। তাই এই প্রত্যক্ষের জ্ঞানকে ভাষায় প্রকাশ করা যায়।

(iv) ঔ একটি জ্ঞেয় বস্তুর যতরকম বিশেষ ভাব বা ধর্ম প্রত্যক্ষ উপস্থাপিত হয় তাদের সবগুলি নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষে প্রকাশিত হয় না।

অপরদিকে জ্ঞেয় বস্তুর যতরকম বিশেষ ভাব বা ধর্ম প্রত্যক্ষে উপস্থাপিত হয় তাদের সবগুলি সবিকল্পক প্রত্যক্ষে উপস্থাপিত হয়।

(v) নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষে বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান সুনির্দিষ্ট এবং সুস্পষ্ট জ্ঞান হয় না। এই প্রত্যক্ষ হল অস্পষ্ট উপলব্ধি মাত্র।

অপরদিকে সবিকল্পক প্রত্যক্ষে বস্তু সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট এবং সুস্পষ্ট জ্ঞান হয়।

(vi) নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষে বস্তুর গুণের পরিচয় পাওয়া যায় না।

অপরদিকে সবিকল্পক প্রত্যক্ষে বস্তুর গুণের পরিচয় পাওয়া যায়।

(vii) নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ হলো বিশেষণ জ্ঞান। বিশেষ্যের

অপরদিকে সবিকল্পক জ্ঞান হলো বিশেষণ যুক্ত বিশেষ্যের জ্ঞান।

(viii) নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয়কে শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা যায় না বলে মহর্ষি গৌতম নির্বিকল্পক জ্ঞানকে - অব্যপদেশ্য জ্ঞান নামে অভিহিত করেছেন।

অপরদিকে সবিকল্পক প্রত্যক্ষকে মহর্ষি গৌতম ব্যবসায়াত্মক (সুনিশ্চিত) প্রত্যক্ষ নামে অভিহিত করেছেন।

---

4) Is indian philosophy Pessimistic ? Discuss
ভারতীয় দর্শন কী দুঃখবাদী বা নৈরাশ্যবাদী।

A- <u>ভারতীয় দর্শন দুঃখবাদী</u> :- ভারতীয় দর্শনের বিরুদ্ধে অভিযোগ হলো ভারতীয় দর্শন দুঃখবাদী। দুঃখবাদ - অনুসারে এই জগৎ ও জীবনে কোন ~~দুঃখ~~ সুখ ও আনন্দ নেই। দুঃখ, জ্বালা, যন্ত্রণা ও নৈরাশ্যের বেদনায় মানুষের কাতরতা শেষ নেই। প্রতিটি মানুষ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত দুঃখের আগুনে জ্বলেছে। সমালোচকদের মতে ভারতীয় দার্শনিক কেবল জীবনের অন্ধকারময় দিকটিকেই দর্শনে চিত্রিত করেছেন।

সমালোচকদের এই অভিযোগ যুক্তিযুক্ত নয়। ভারতীয় দার্শনিকরা দর্শনের অর্থে মানুষের জীবনের গভীর সমস্যার কথা বলেছেন। ভারতীয়দের কাছে দর্শন কেবলমাত্র তত্ত্ব-আলোচনা নয়, তাদের মতে দর্শন হলো জীবনকে - যথাযথ ভাবে পরিচালিত করে চরম লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যম। তাই বাস্তব জীবনের দিকে তাকিয়ে ভারতীয়

দার্শনিকেরা জীবনের দুঃখ, জ্বালা, যন্ত্রনার কথা অস্বীকার করতে পারেননি। বৌদ্ধ দর্শনে আমরা দুঃখবাদের এক সুস্পষ্ট রূপ দেখতে পাই। বৌদ্ধ দর্শনে বলা হয়েছে 'সর্বং দুঃখম্' অর্থাৎ সবই দুঃখময়। সকল সুখের মধ্যেই দুঃখের বীজ প্রচ্ছন্ন আছে। বুদ্ধদেব বলেছেন সবকিছুই অনিত্য, আর যাকিছু অনিত্য তাকিছুই দুঃখ।

ষড়দর্শনের (৬টি) প্রত্যেকটিতে দুঃখবাদ আলোচনা করা হয়েছে। সাংখ্যকার কপিলের মতে এই জীবনে অনাবিল সুখের স্থান নেই, জন্ম এবং জীবন উভয়ই দুঃখপূর্ন। জন্ম ও জীবন উভয়ই দুঃখপূর্ন। তিনি তিনপ্রকার দুঃখের কথা বলেছেন — ⓘ আধ্যাত্মিক ⓘⓘ আধিভৌতিক ⓘⓘⓘ আধিদৈবিক। পতঞ্জলির মতে এই সংসার দুঃখময়। তিনিও তিনপ্রকার দুঃখের কথা বলেছেন। যথা — ⓘ পরিনাম দুঃখ, ⓘⓘ তাপ দুঃখ ⓘⓘⓘ সংস্কার দুঃখ।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করার বিষয় যে দুঃখেই জীবন শুরু, দুঃখেই জীবন শেষ — এই নৈরাশ্যময় জীবনের চিত্র কোন ভারতীয় দর্শনেই আমরা পাই না, বরং সকল ভারতীয় দর্শনই স্বীকার করে যে, দুঃখ থেকে পরিত্রান লাভের উপায় আছে এবং মানুষ নিজের চেষ্টায় দুঃখময় জীবন থেকে মুক্তিলাভ করতে পারে। ন্যায়কারেরা বলেন যে, দুঃখ আছে বলেই দুঃখ বিপরীত

মানুষ দুঃখ নিবৃত্তির উপায় অনুসন্ধান করেন। যোগ দর্শনও জাগতিক দুঃখ থেকে পরিত্রান লাভের জন্য অষ্টাঙ্গিকেই শ্রেষ্ঠ উপায় রূপে নির্দেশ করেছে। বৈশেষিক দর্শনও স্বীকার করে যে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হলেই সব দুঃখের নিবৃত্তি ঘটে। বেদান্তে বলা হয়েছে যে অবিদ্যাই দুঃখের মূল তাই অবিদ্যাকে দূরিভূত করলে মানুষকে আনন্দের অধিকারী এবং পরম শান্তির রাজ্যে নিয়ে যায়।

— এইসব দিক থেকে ভারতীয় দর্শনকে কোন মতেই দুঃখবাদী বলা চলে না। ম্যাক্স মুলারের মতে সকল ভারতীয় দর্শনই যখন দুঃখ দূর করতে সমর্থক হলে দাবী করে তখন দুঃখবাদী বলতে শপিনহাওয়ার যা বুঝে থাকি সেই অর্থে তাদের দুঃখবাদী বলা চলে না। ভারতীয় দর্শন দুঃখবাদী তো নয়ই বরং আশাবাদী। ভারতীয় দর্শনের শুরুতে দুঃখ থাকলেও দুঃখেই তা শেষ হয়নি। ম্যাক্সমুলারের মতে জগতের দুঃখের উপস্থিতি তাদের দার্শনিক চিন্তার প্রথম প্রেরনা যোগায়। ভারতীয় দার্শনিকরাই দুঃখপীড়িত, ক্লেশ জর্জরিত মানুষকে প্রথম আশার বানী শুনিয়েছেন।

পরিশেষে বলা যায় যে, ভারতীয় দর্শন দুঃখবাদী নয় বরং আশাবাদী। ভারতীয় দর্শনের মতে শুরুতেই দুঃখ শেষ নয়। দুঃখই জীবনের শেষ কথা নয়, শান্তির দ্বারা প্রাপ্ত উপলব্ধি হলো মানব জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য যা মানুষের জীবনকে সুন্দর ও সার্থক করে তোলে।

5) State and explain the eight fold path (Astangika marga) Admitted in buddhism. VIP 6/12

বৌদ্ধ দর্শন অনুসারে অষ্টাঙ্গিক মার্গ ব্যাখ্যা করো।

→ **অষ্টাঙ্গিক মার্গ** :- বৌদ্ধ দর্শনে বলা হয়েছে দুঃখ নিরোধের মার্গ বা পথ আছে। যে পথ অনুসরণ করে দুঃখ থেকে চিরমুক্তি লাভ করা যায়, তাকে বলা হয় দুঃখ নিরোধ মার্গ। এই পথ বা মার্গের সংখ্যা আটটি বলে একে অষ্টাঙ্গিক মার্গ বলা হয়। বৌদ্ধ ভিক্ষুই হোক কিংবা সাধারণ মানুষই হোক সকলেই এই পথ অনুসরণ করতে পারে। অষ্টাঙ্গিক মার্গগুলি হলো ------ ① সম্যক দৃষ্টি ② সম্যক সংকল্প, ③ সম্যক বাক্ ④ সম্যক কর্মান্ত ⑤ সম্যক আজীব ⑥ সম্যক ব্যায়াম ⑦ সম্যক স্মৃতি ⑧ সম্যক সমাধি।

① **সম্যক দৃষ্টি** :- সম্যক শব্দের অর্থ হলো যথার্থ। এবং দৃষ্টি শব্দের অর্থ এখানে জ্ঞান। অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞানই হলো সম্যক দৃষ্টি। আমাদের সকল দুঃখের মূলে হল অবিদ্যা। অবিদ্যার জন্যই আমরা সাংসারিক সুখকে প্রকৃত সুখ মনে করি, যা অনিত্য ও পরিবর্তনশীল তাকে নিত্য সত্য মনে করে তাকে পাবার জন্য ছুটে যাই। এভাবেই মিথ্যাকে সত্য মনে করে আমরা নানা দুঃখ ভোগ করি। সুতরাং সর্বাগ্রে এই মিথ্যা দৃষ্টি বর্জন করে সম্যক দৃষ্টি অর্জন করতে হবে। চারটি আর্যসত্যের তাৎপর্য যথার্থ উপলব্ধি করাকেই বলে সম্যক দৃষ্টি।

P.T.O

② সম্যক সংকল্প :- যাকে সত্য বলে উপলব্ধি করেছি সেই সত্য অনুসারে কাজ করার, জীবন পরিচালনা করার সংকল্প করা চাই। শুধু তাত্ত্বিক জ্ঞান থাকলেই চলবে না, তাকে কার্যে পরিণত করা এবং জীবনে প্রয়োগ করার জন্য দৃঢ় সংকল্প প্রয়োজন। কাজেই সত্য দৃষ্টি অনুযায়ী যা পাওয়া গিয়েছে তাকে কার্যে রূপান্তরিত করার দৃঢ় সংকল্প চাই। নির্বাণ লাভের জন্য সর্বপ্রকার হিংসা, মিথ্যা ভাষণ, ও পরের অপকার থেকে নিজেকে নিবৃত্ত করা প্রয়োজন। সংযত বাক ও সৎকর্মের সংকল্পই এই প্রয়োজন সাধন করতে পারে।

③ সম্যক বাক :- সম্যক সংকল্প কার্যে রূপায়িত করার জন্য প্রথমেই প্রয়োজন বাক সংযমের। বিভিন্ন কর্মের মধ্যে বাকই প্রথম ও প্রধান, বাক সংযম না করতে পারলে নৈতিক উন্নতির আশা করা যায় না। সর্বদা সত্য কথা বলতে হবে। সত্য কথা বলতে গিয়ে যদি মৃত্যুও ঘটে তবুও মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া চলবে না। শুধু মিথ্যা ভাষণ থেকে বিরত থাকলেই চলবে না, পরনিন্দা ও কর্কশ বাক্য পরিহার করতে হবে. এটাই হলো সম্যক বাক। বাক সংযম মোটেই সহজ নয়, এর জন্য মনের ওপর কঠোর শাসন থাকা প্রয়োজন।

④ সম্যক কর্মান্ত :- সম্যক কর্মান্ত মানে সংযত ভাবে আচরণ ও কর্ম করা। প্রাণনাশ না করা, আমাকে যা দেওয়া হয়নি তা গ্রহণ না করা, কামভোগ থেকে বিরত থাকাই হলো সম্যক কর্মান্ত। শীল ও দানকে বুদ্ধদেব সম্যক কর্মান্ত বলে বর্ণনা করেছেন। চুরি, হিংসা

বহু সংসারের অজ্ঞত সমাধান প্রয়োজন। এঅসবের জন্য নির্বাণ লাভের পথ প্রশস্ত হয়।

(৪) সম্যক সমাধি :- পূর্বোক্ত সাতটি অঙ্গের অনুষ্ঠানের ফলে মন অন্য চিন্তা দূর হয়, আচরণ সংযত হয়, ইন্দ্রিয় বশীভূত হয় — তখনই সমাধির আদর্শ জন্মায়। যিনি অন্য চিন্তা দূর করে মনকে মুক্ত করতে পেরেছেন ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করতে পেরেছেন তিনিই সমাধির মাধ্যমে নির্বাণ লাভ করতে পারবেন।

6) Explain the Concept of 'Bhavachakra' following Buddhism।
বৌদ্ধ দর্শন অনুসারে ভব চক্রের ব্যাখ্যা দাও। VIP

A- ভবচক্র :- বৌদ্ধ মতে দুঃখের কারণ অনুসন্ধান উৎপন্ন বস্তু হওয়ায় তা পুনরায় অপর কোন কারণের উপর নির্ভরশীল। এভাবে দুঃখের কারণ অনুসন্ধান করতে যে এক চক্রাকার কারণ শৃঙ্খল সৃষ্টি করে সেই কারণ শৃঙ্খলকে বলা হয় ভবচক্র। এই ভবচক্রে ১২ টি নিদান থাকায় একে দ্বাদশ নিদানও বলা হয়। ভবচক্রের যে শৃঙ্খল তা নিম্নে আলোচনা করা হলো —

প্রতীত্য সমুৎপাদ নিয়ম অনুসারে এ জগতে কোনকিছুই অকারণে ঘটতে পারে না। প্রত্যেক ঘটনাই কোন পূর্ববর্তী ঘটনা থেকে সৃষ্টি হয়। তাই বলা যায় দুঃখ যেহেতু একটি ঘটনা সেহেতু এটি বিনা কারণে ঘটতে পারে না। এই দুঃখেরও কারণ আছে। ব্যাধি, জরা, মরণ, নৈরাশ্য, শোক অর্থাৎ এই জরা মরণের কারণ হলো জাতী বা জন্ম। জীব যদি জন্মগ্রহণ না করত

তাহলে তাকে ব্যাধি, জরা, মরণের অধীন হতে হতো
না। কিন্তু জন্মেরও কোন কারণ নিশ্চই আছে, কেননা
জন্ম অকারণে হতে পারে না। বৌদ্ধ দর্শনে জন্মের
কারণকে বলা হয় ভব। ভব মানে হলো পুনরায়
জন্মগ্রহণ করার ব্যাকুলতা। কিন্তু এই ব্যাকুলতার কারণ
কী? এর কারণ হলো উপাদান বা জাগতিক
বিষয়ের প্রতি আসক্তি। কিন্তু এই আসক্তির উদ্ভব
হয় কেন? এর কারণ হলো তৃষ্ণা, আবার এই
তৃষ্ণার কারণ হলো বেদনা বা সুখ প্রীতি মিশ্রিত
পূর্ব ইন্দ্রীয় অভিজ্ঞতা। আমরা যে বস্তু ভোগ করেছি
এবং আমাদের সুখের অনুভূতি ঘটেছে। সেই সুখ
অনুভূতি হলো বেদনা যা তৃষ্ণার কারণ। কিন্তু
বস্তুর সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ বা স্পর্শ না ঘটলে
ইন্দ্রিয় সুখের বা বেদনার উদ্ভব সম্ভব হয় না। কিন্তু
এই সংযোগ বা এই স্পর্শ কীভাবে সম্ভব হবে যদি
ষড়ায়তন অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জীহ্বা, ত্বক ও
মন উপস্থিত না থাকে কিন্তু ষড়ায়তন বা ছয়টি
ইন্দ্রিয় কিভাবে কাজ করতে পারে যদি কোন নাম রূপ
বা দেহ মনের সংগঠন না থাকে। আবার এই
নামরূপের অস্তিত্ব কখনই সম্ভব হত না, যদি
চেতনা বা বিদ্যা না থাকত। চেতনা থাকে বলেই
এই জীবদেহ মাতৃগর্ভে দিন দিন বর্ধিত হতে থাকে।
কিন্তু এই চেতনা বা বিজ্ঞানের কারণ কী? এর
কারণ হলো ~~সংস্কার~~ সংস্কার। পূর্ব বা অতীত
জীবনের যেসব কর্ম সম্পাদিত হয়, সেইসব কর্ম
একপ্রকার শক্তি উৎপন্ন করে তাকে বলা হয় সংস্কার।
সংস্কার হলো অতীত জীবনের অভিজ্ঞতার ছাপ।
মাতৃগর্ভে ভ্রূণের মধ্যে এই সংস্কারই চেতনার সৃষ্টি করে।

এই সংস্কারের কারন কী? এই সংস্কারের কারন হল অবিদ্যা। যার জন্য পুনঃজন্ম হয়ে থাকে। অবিদ্যা হলো চারটি আর্যসত্য সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞানের অভাব বা তত্ত্ব জ্ঞানের অভাব। অবিদ্যার জন্য মানুষ মিথ্যা জ্ঞানকে সত্য জ্ঞান বলে জানে আর যেখানে দুঃখ আছে সেখানে সুখ আছে বলে মনে করে। শেষ মুহূর্তে দেখলাম দুঃখের কারণ হলো অবিদ্যা।

বৌদ্ধ দর্শনে দুঃখের কার্য কারন শৃঙ্খল বর্ননার মধ্যে আমরা দেখতে পাই মোট ১২ টি কারন আছে। দুঃখ থেকে অবিদ্যা বা অবিদ্যা থেকে দুঃখ পর্যন্ত মোট ১২ টি নিদান আছে। সেইজন্য বৌদ্ধ দর্শনের কার্য কারন শৃঙ্খলকে দ্বাদশ নিদান বা ভবচক্র বলা হয়। একে ভবচক্র বলার কারন হলো কার্যকারন শৃঙ্খলের ১২ টি নিদান মানুষকে জন্ম, দুঃখ, ভোগ ও পুনর্জন্ম এর মধ্যে দিয়ে বারম্বার সংসারে চাকার মতো ঘোরাচ্ছে। ভবচক্র ছাড়াও একে সংসার চক্র, জন্ম ও মরন চক্র, ধর্ম চক্র ও প্রতীত্য সমুৎপাদ চক্র বলা হয়ে থাকে।

□ পূর্বে কারন চক্র শৃঙ্খল লক্ষ করলে আমরা দেখতে পাই যে, অতীতে আমরা যে জীবন লাভ করেছিলাম, বর্তমানে যে জীবন ভোগ করছি এবং ভবিষ্যতে পুনঃজন্ম হলে যে জীবন লাভ করব, তার মধ্যে এক গভীর যোগসূত্র আছে। একটি থেকে আরেকটির উৎপত্তি এবং একটির নিরোধে আরেকটির নিরোধ। অতীত জীবন বর্তমান জীবন নির্ধারিত করেছে। ছকের সাহায্যে বিষয়টিকে দেখানো হলো ____

i) অবিদ্যা :- অতীত জীবন (তত্ত্ব জ্ঞানের অভাব)

ii) সংস্কার :- অতীত জীবন (স্মৃতি চিহ্ন হিসাবে মনের মধ্যে যা বিরাজ করে)।

iii) বিজ্ঞান = বর্তমান (চেতনা)

iv) নামরূপ = বর্তমান (দেহ সংযুক্ত মন)

v) ষড়ায়তন = বর্তমান (ছয়টি ইন্দ্রিয়)

vi) স্পর্শ = বর্তমান (বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ)

vii) বেদনা = বর্তমান (সুখ, দুঃখ, বিতৃষ্ণা, অনুভূতি চিহ্ন)

viii) তৃষ্ণা = বর্তমান (ভোগ্য বস্তুকে ভোগ করার আকাঙ্ক্ষার)

ix) উপাদান = বর্তমান (বিষয় বস্তু)

x) ভব = বর্তমান (জন্মগ্রহণ করার ইচ্ছা)

xi) জাতি = ভবিষ্যৎ জীবন (জন্ম)

xii) দুঃখ = ভবিষ্যৎ জীবন

এই তালিকাটির সাহায্যে অতি সহজে বোঝা যায়, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনের মধ্যে এক সুন্দর যোগসূত্র আছে।

7) সাংখ্য দর্শন মতে পুরুষের অস্তিত্ব সম্পন্ন যুক্তিগুলি কী কী?

A. সাংখ্য দর্শন দ্বৈতবাদী, কারণ সাংখ্যদর্শন দুটি মূল তত্ত্বে বিশ্বাসী। তত্ত্ব দুটি হলো পুরুষ ও প্রকৃতি। পুরুষ হলো সাংখ্য দর্শনের দ্বিতীয় মূল তত্ত্ব। সাংখ্য দর্শনে আত্মাকে পুরুষ নামে অভিহিত করা হয়। এই আত্মা কোন জ্ঞানের বিষয় কিংবা ব্যাখ্যিত বস্তু কোনটি নয়।

পুরুষের অস্তিত্বের সপক্ষে যুক্তি : সাংখ্যকারিকায় যে শ্লোকটি পুরুষ বা আত্মার অস্তিত্ব প্রমান করে তা হল — "সংঘাতপরার্থত্বাৎ ত্রিগুণাদিবিপর্যয়াদ অধিষ্ঠানাৎ পুরুষোঽস্তি ভোক্তৃভাবাৎ কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেশ্চ।" এই শ্লোকটি বিশ্লেষন করলে যে প্রমানগুলি পাওয়া যায় তা হল —

১. সংঘাতপরার্থত্বাৎ :— যা প্রকৃতির উপাদান বা অংশের সমন্বিত তাই হল সংঘাত। এই সংঘাত বস্তু মাত্রই অন্যের প্রয়োজন সাধন করে। যেমন – চেয়ার, টেবিল, ঘট, খাট, প্রভৃতি সংঘাত বস্তু এবং এগুলি পর প্রয়োজনে নির্মিত। এই সংঘাত বস্তু অপরই প্রয়োজন সাধন করে। এইসব সংঘাত বস্তুর অতিরিক্ত সত্তা হল পুরুষ বা আত্মা।

২. ত্রিগুণাদিবিপর্যয়াদ :— (সকল) বস্তুরই তিনটি গুন আছে। এই তিনটি হলো সত্ত্ব, রজঃ, ও তম। কাজেই এদের দ্রষ্টা হিসাবে এমন একটি সত্তার অস্তিত্ব থাকতে হবে, যার মধ্যে শুদ্ধ চৈতন্য আছে। কিন্তু তিনটি গুন নেই। দৃশ্য ও দ্রষ্টার ভেদ স্বীকার করতেই হয়। দৃশ্য থাকলে তার বিপরীত গুন সম্পন্ন দ্রষ্টা থাকবেই। এই দৃশ্যমান জগৎ ত্রিগুনাত্মক অচেতন ও পরিবর্তনশীল। সুতরাং এই জগতের দ্রষ্টা হিসাবে ত্রিগুনাতীত, চেতন, অপরিবর্তনীয় সত্তা স্বীকার করতে হয়। এই সত্তাই হলো পুরুষ।

৩. অধিষ্ঠানাৎ :- অধিষ্ঠান কথার অর্থ হলো পরিচালক বা আশ্রয়। মন, বুদ্ধি প্রভৃতি অচেতন বস্তু নিজে নিজে ক্রিয়াশীল হতে পারেন। যে জন্যই এদের পরিচালক বা আশ্রয়ের দরকার। সচেতন একজন রথী না থাকলে যেমন অচেতন রথ ঠিক পথে চলতে পারে না, তেমনি অচেতন প্রকৃতির কার্য যে নিয়ম শৃঙ্খলার সাথে ঘটতে দেখা যায় তাও কোনো সচেতন সত্তার সাহায্য ছাড়া হতে পারে না। এই সচেতন সত্তাই হলো পুরুষ বা আত্মা।

৪. ভোক্তৃভাবাৎ :- প্রকৃতি হলো অচেতন আর এই অচেতন প্রকৃতি যেসব কার্য ঘটায় সেগুলিকে ভোগ করার জন্য এক সচেতন সত্তা স্বীকার করতে হয়। আমরা যেসব সুখ-দুঃখ ভোগ করে থাকি, তার ভোক্তা কে? সুখ তো ভোগের জিনিস, যা প্রকৃতি থেকে উদ্ভূত হয় তা সবই জড় ও অচেতন। কাজেই তাদের ভোগ করার ক্ষমতা নেই। কিন্তু ভোগ্য বস্তু থাকলে ভোক্তাও থাকবে। সচেতন পুরুষই হলো সেই ভোক্তা।

৫. কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেঃ :- মহর্ষি প্রভৃতি ব্যক্তিরা মুক্তির কথা বলে থাকেন। কৈবল্য বা মুক্তি হলো দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি। প্রকৃতি বা প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন বস্তু হলো অচেতন এবং তা দুঃখময় কাজেই তাদের পক্ষে দুঃখ থেকে মুক্তির প্রশ্ন ওঠে না। তাই প্রকৃতি থেকে স্বতন্ত্র এক সচেতন সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়। নইলে কৈবল্য লাভের চেষ্টার কোন অর্থ হয় না। এই সচেতন সত্তাই হল পুরুষ।

পুরুষের বহুত্ব : সাংখ্য মতে পুরুষ বা আত্মা এক নয়। বহু বহু পুরুষের সমর্থনে নিম্নে বিভিন্ন যুক্তি দেওয়া হল।

i) আত্মা যদি এক হত তাহলে একজনের জন্ম হলে সকলের জন্ম হত এবং একজনের মৃত্যু হলে সকলের মৃত্যু হত। একজন যদি অন্ধ হয় সকলেই অন্ধ হত। কিন্তু তা বাস্তবে দেখা যায় না কেন? কাজেই সিদ্ধান্ত করা যায় পুরুষ এক নয় বহু।

ii) আত্মা যদি বহু না হয়ে এক হত তাহলে এক ব্যক্তি কোন কাজে প্রবৃত্ত হলে অন্য সকলেও সেই একই কার্যে প্রবৃত্ত হত। কিন্তু বাস্তবে তা দেখা যায় না। যখন কোন ব্যক্তি ধর্ম কাজে নিযুক্ত থাকে তখন অপর ব্যক্তি অধর্ম কাজে নিযুক্ত হয়। তাই বলা যায় পুরুষ এক নয় বহু।

iii) সত্ত্বঃ, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুনের ভিন্নতাও পুরুষের বহুত্ব প্রমাণ করে। সত্ত্ব গুনের প্রাধান্যের জন্য কোন ব্যক্তি সুখি, রজগুনের প্রাধান্যের জন্যে কোন ব্যক্তি দুঃখি আবার তম গুনের প্রাধান্যের জন্যে মোহমুগ্ধ। সুতরাং এই তিনটি গুনের ভিন্নতা আত্মার বহুত্ব প্রমাণ করে।

iv) পুরুষ বা আত্মা একটি হলে সকল জীবের মোক্ষ লাভ একই সময়ে হত। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে, লক্ষ লক্ষ বদ্ধ জীবের মধ্যে মাত্র একজন বা দুইজন মানুষের আপন সাধনা বা প্রচেষ্টার ফলে মুক্তিলাভ করে। কাজেই পুরুষের বহুত্বকে অবশ্যই স্বীকার করতে হয়।

11.10.2

8) বৌদ্ধ দর্শন অনুসারে নৈরাত্ম্যবাদ আলোচনা করো।

A. নৈরাত্ম্যবাদ :- ভারতীয় দর্শনের আস্তিক সম্প্রদায় মনে করেন আত্মা অবিনশ্বর ও অপরিবর্তনীয় সত্তা। তাদের মতে জীবের মৃত্যুতে আত্মার মৃত্যু হয় না। অর্থাৎ মৃত্যু হলে আত্মার দেহ পরিবর্তন হয়। এককথায় পুরাতন ও জীর্ণ দেহ ত্যাগ করার নামই হল মৃত্যু। তাদের মতে আত্মা এক দেহ ত্যাগ করে অন্য আরেক দেহ গ্রহণ করে। শাশ্বত ও সনাতন আত্মা দেহ থেকে দেহান্তরে ঘুরে বেড়ায়।

বুদ্ধদেব আত্মার অস্তিত্ব সম্পর্কে আস্তিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে একমত নন। তিনি প্রতীত্য সমুৎপাদ তত্ত্বের সাহায্যে ক্ষণিকবাদ প্রচার করেন। প্রতীত্য সমুৎপাদ তত্ত্ব অনুসারে বিশ্বের প্রতিটি ঘটনার কারণ আছে। কারণ কার্য সৃষ্টি করে এবং সেই কার্যের মধ্যেই কারণ বিলীন হয়ে যায়। অর্থাৎ কার্য সৃষ্টিতেই কারণের সার্থকতা, তাই বুদ্ধদেব বলেছেন- 'সর্বম অনিত্যম'। বিশ্বের সবকিছুই যেহেতু অনিত্য বা অস্থায়ী সেহেতু স্থায়ী শাশ্বত ও সনাতন আত্মা নামক কোন সত্তা থাকতে পারে না। তিনি আরো বলেছেন যে আমরা আমাদের মনের মধ্যে তাকালে যে বিষয়গুলির সন্ধান পাই তা হলো চেতনার প্রবাহ। দৈনন্দিন জীবনে আমাদের চিন্তা, অনুভূতি, ইচ্ছা প্রভৃতি মানসিক অনুভূতি অনবরত উদয় হয়, আবার পরমুহূর্তেই তা বিলীন হয়ে যায়।

বুদ্ধদেবের মতে শাশ্বত চেতনা নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহমান অবস্থাকেই আমরা শাশ্বত আত্মা মনে করে ভুল করে থাকি। প্রকৃতই আত্মার কোন অস্তিত্ব নেই। কাজেই আত্মা হলো চেতনার বিরামহীন প্রবাহ, এবং-

চিরপ্রবহমান মানসিক প্রক্রিয়ার পেছনে কোন শাশ্বত আত্মার অস্তিত্ব নেই। ~~কাজেই আত্মার~~ তিনি যে আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন সেই আত্মা হলো মানসিক প্রক্রিয়ার অবিরাম প্রবাহ। আত্মা সম্পর্কে বুদ্ধদেবের মতবাদই নৈরাত্মবাদ নামে পরিচিত।

বুদ্ধদেবের খ্যাতনামা শিষ্য নাগসেন স্থায়ী আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করে রথের উপমা দিয়ে আত্মার কথা ব্যাখ্যা করেন। রথ যেমন চক্র তার (Spoke) দন্ড প্রভৃতির সমষ্টিমাত্র এবং এদের অতিরিক্ত কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নয়, তেমনি আত্মা - পঞ্চস্কন্ধের সমষ্টি। বুদ্ধদেব বলেছেন যে যখন আমরা 'আমি' শব্দটি ব্যবহার করি সেই 'আমি' হল পঞ্চস্কন্ধের সমষ্টি। আত্মা যে পঞ্চস্কন্ধের সমষ্টি তা হল রূপ বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান। এর অতিরিক্ত কোন কিছু নয়। কাজেই মানুষ শব্দটি একটি প্রথাগত নাম। এর মধ্যে কোন শাশ্বত আত্মার অস্তিত্ব নেই। মানুষ হল কতগুলি উপাদান, যেমন - কায় (দেহ), মন ও চেতনার সমষ্টি। বৌদ্ধ দর্শনে যখন বলা হয় আত্মা পঞ্চস্কন্ধের সমষ্টি তখন ঐ পঞ্চস্কন্ধের অতিরিক্ত কোন স্থায়ী শাশ্বত ও সনাতন আত্মার অস্তিত্ব থাকেনা।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে আত্মা সম্পর্কে বৌদ্ধ দর্শনের এই মতবাদ পাশ্চাত্য দর্শনের অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক ডেভিড-হিউম এবং মনোবিদ উইলিয়াম জেমসের মতবাদের সঙ্গে অনেকটা সামঞ্জস্যপূর্ণ। হিউমের মতে আত্মা বলে কোন কিছু নেই। কতগুলি বিচ্ছিন্ন অনুভূতির বা মানসিক - প্রক্রিয়ার সমষ্টিই হল আত্মা। এ প্রসঙ্গে তার উক্তিটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে - যখন আমরা আমিকে অন্বেষণের জন্য নিজের মধ্যে ডুব দেই তখন তার নাগাল পাই।

তা হলো উত্তাপ বা ঠান্ডা, আলো বা ছায়া, প্রেম বা ঘৃনা; সুখ বা দুঃখের আবেদন মাত্র। অনুরূপ জেমসও একই কথা বলেছেন। চৈতন্যের অবিচ্ছিন্ন ধারাই হল আত্মা, এছাড়া বা দেহের মধ্যে কোন আত্মার অস্তিত্ব নেই।

প্রশ্নটি স্বাভাবিক যে, স্থায়ী সনাতন আত্মা যদি না থাকে তাহলে মানুষের কৈশোর, শৈশব, যৌবন ও বার্ধক্যের মধ্যে অভিন্নতা ব্যাখ্যা করা কীভাবে সম্ভব? উত্তরে বুদ্ধদেব বলেছেন যে, কোন অপরিবর্তনীয় শাশ্বত সত্তা অস্তিত্ব না থাকলেও জীবনের বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে এক ধারাবাহিকতা বিদ্যমান থাকে। তার মতে জীবনের প্রতিটি অবস্থা তার পূর্ববর্তী অবস্থা থেকে উদ্ভূত আবার পরবর্তী অবস্থার জন্ম দিয়ে ওই পূর্ববর্তী অবস্থা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। কাজেই জীবনের ধারাবাহিকতার মূলে রয়েছে এক শাশ্বত কার্য-কারণের যোগসূত্র। বিষয়টিকে তিনি উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করেন। সারারাত ধরে একটি প্রদীপ জ্বলছে এবং প্রতি মুহূর্তে প্রদীপের একটি শিখাই জ্বলতে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রতিমুহূর্তে প্রদীপের সলতের তেলের ভিন্ন ভিন্ন অংশ পুড়ছে। এই প্রদীপ শিখার মধ্যে যে ধারাবাহিকতা আছে তার মধ্যেই আমরা একটি মাত্র প্রদীপ শিখাই দেখতে পাচ্ছি। অনুরূপ জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত বিচ্ছিন্ন হলেও তাদের মধ্যে ধারাবাহিকতা আছে বলেই ওই বিচ্ছিন্ন মুহূর্তকে ওই সূত্রে বেঁধে নিয়ে স্থায়ী আত্মার অস্তিত্ব আছে বলে ধরে নিই।

সমালোচনা :- সমালোচকরা বলেছেন শাশ্বত আত্মা যদি স্বীকার করা না হয় তাহলে স্মৃতি, প্রত্যভিজ্ঞা, ব্যক্তির অভিন্নতা বোধ এবং সর্বোপরি দৈনন্দিন জীবনের

অভিজ্ঞতাকে ব্যাখ্যা করা যায় না।

(ii) স্থায়ী আত্মা যদি স্বীকার করা না হয় তাহলে নৈতিক জীবন যাপন ও মোক্ষলাভ অর্থহীন হয়ে পড়বে। স্থায়ী আত্মা ছাড়া ক্ষণিক মানুষ নৈতিক আদর্শ লাভের জন্য সচেতন হবে না। আর স্থায়ী আত্মা না থাকলে মুক্তি লাভের প্রশ্ন অবান্তর হয়ে যায়।

---

7) ভারতীয় দর্শন অনুসারে নাস্তিক শব্দটি ব্যাখ্যা কর। 2021

A. নাস্তিক দর্শন :- ভারতীয় দর্শনগুলিকে প্রধানত দুটি শ্রেনীতে ভাগ করা হয়েছে। যথা- (i) আস্তিক (ii) নাস্তিক।

নাস্তিক বলতে সাধারনত আমরা বুঝি যারা ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে না। কিন্তু ভারতীয় দর্শনে নাস্তিক বলতে বোঝায় যারা বেদের প্রামান্য এবং বেদকে প্রামানিক শাস্ত্র বলে গ্রহন করেন না তাদের নাস্তিক বলা হয়। নাস্তিক দর্শনকে আবার দুইভাগে ভাগ করা যায়। যথা - 1. চরমপন্থী ও 2. নরমপন্থী। ঘোরতর বেদ বিরোধী হলো চরমপন্থী যথা চার্বাক দর্শন। চার্বাকের পূর্ব নাস্তিক বা নাস্তিক শিরমনি বলা হয় কারন তারা সম্পূর্ন ভাবেই বেদ বিরোধী। বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদায় পরলোক ও জন্মান্তরে বিশ্বাস করলেও বেদের বিরোধীতা করেছেন। তাই বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনকে আংশিক নাস্তিক বলা যায়। অর্থাৎ নরমপন্থী।

10) ভারতীয় দর্শন অনুসারে আস্তিক বলতে কী বোঝায়?

A. <u>আস্তিক দর্শন</u> :- প্রচলিত ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়কে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়। যথা- আস্তিক ও নাস্তিক।

আস্তিক বলতে সাধারণত বোঝায় যারা ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে। কিন্তু ভারতীয় দর্শনে আস্তিক বলতে তাদেরকেই বোঝায় যারা বেদকে প্রমাণ করে স্বীকার করেন। অর্থাৎ যারা বৈদিক জীবন চর্যা ও দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্বাস করে। আস্তিক দর্শনগুলি হলো সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা ও বেদান্ত। আস্তিক দর্শনের সংখ্যা ছয়টি বলে ষড়দর্শন বলা হয়। ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার না করেও যদি কোন দর্শন বেদকে প্রামাণ্য বলে স্বীকার করে তাহলেও তাকে আস্তিক দর্শন বলে গণ্য করা হবে। সাংখ্য ও মীমাংসা দর্শনে ঈশ্বরকে স্বীকার করা হয়নি তবুও এই দুটি দর্শনকে আস্তিক দর্শন বলা হয়।

আস্তিক দর্শন আবার দুই প্রকার। যথা- ① বেদ অনুগত ও ② বেদ স্বতন্ত্র। যেসব দর্শন সরাসরি বেদের উপর প্রতিষ্ঠিত তারা বেদ অনুগত। যেমন- মীমাংসা ও বেদান্ত। আর যেসব দর্শন বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করেও বেদের উপর সরাসরি ভাবে প্রতিষ্ঠিত নয় তারা বেদ স্বতন্ত্র। যেমন- সাংখ্য যোগ, ন্যায় ও বৈশেষিক।

11) What is Atma according to upanisad ?

A- আত্মা :- উপনিষদের ঋষিরা অন্তর্মুখী দৃষ্টিতে জীবজগতের ঐক্য বিধানের জন্য আত্মার অস্তিত্ব প্রতিপাদন করেছেন। বহু বিচিত্র জীবজগতের অন্তরালে যদি কোন ঐক্য বিধায়ক সত্তা না থাকে, মানুষের বহু বিচিত্র আত্মার যদি এক বিরোহিত হয়, জীবাত্মা যদি একটি মূল সূত্রে বদ্ধ না হয়, যদি সুখ-দুঃখ, বিরোহ-মিলনে, । মানুষের আত্মার অর্ন্তজগন বিচ্ছিন্ন হয়, তাহলে এই আত্মার বাসযোগ্য হতে পারে না, তা অচিরেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। জীব আত্মাকে অশেষ বিরোধ-বিদ্বেষ এর মধ্যেও এক মঙ্গলময়ের বন্ধন সূত্র - আত্মার ঐক্য সূত্র স্বীকার করতে হয়।

উপনিষদে আত্মা বলতে কোন ব্যক্তি চেতনাকে বোঝানো হয়নি। আত্মা হল নির্বিশেষ চেতনা, সমস্ত জীব চৈতন্যের মধ্যে অবিচ্ছিন্নভাবে অনুবর্তমান চেতনা এই আত্মাই স্বয়ং, সৎ, স্বয়ংবেদ্য। জীবাত্মা সকল অদ্বয় আত্মা থেকে উৎসারিত, আত্মা জীবজগতেই পরিব্যাপ্ত জড় জগতে নয়।

12) Explain in brief the Concept of liberation. (Mukti) in indian philosophy.

A- ভারতীয় দর্শনে মোক্ষ বা মুক্তি :- জড়বাদী চার্বাক দার্শনিক ছাড়া সকলেই মোক্ষকেই একমাত্র পুরুষার্থ বলে স্বীকার করেছেন। কিন্তু মোক্ষের স্বরূপ সম্পর্কে সকলের অভিমত এক নয়। বৌদ্ধ দর্শনে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি বা দুঃখ থেকে চিরমুক্তি লাভকেই নির্বাণ বলা হয়েছে। বৌদ্ধ দর্শনে মোক্ষকেই নির্বাণ

নামে অভিহিত করা হয়েছে। কারোমতে নির্বাণের অর্থ হল শাশ্বত আনন্দের অবস্থা।

জৈন দর্শন মতে আত্মার স্বরূপে অবস্থানই হল মোক্ষ। আত্মা স্বাভাবিকভাবে অনন্ত দর্শন, অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত শক্তি ও অনন্ত আনন্দের আশ্রয়। সম্যক জ্ঞান, সম্যক দর্শন ও সম্যক চরিত্র মোক্ষ লাভের উপায়।

ন্যায় বৈশেষিক দর্শনে বলা হয়েছে যে, দেহ ও মনের সঙ্গে আত্মার যখন সংযোগ নষ্ট হয় এবং আত্মা স্বরূপে অবস্থান করে, তখনি মোক্ষ লাভ হয়। আত্মা স্বরূপ নির্গুণ নিষ্ক্রিয় অচেতন দ্রব্য। মোক্ষ দুঃখের সাময়িক নিবৃত্তি নয়, দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি। এদের মতে শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন মোক্ষ লাভের উপায়।

সাংখ্য যোগ দর্শন মতে বিবেক, খ্যাতি, দুঃখ হানির এবং কৈবল্য লাভের উপায়। অষ্টাঙ্গিক যোগের অনুষ্ঠানে চিত্ত শুদ্ধি ঘটে এবং বিবেক খ্যাতি জাগে, যার ফলে কৈবল্য লাভ ঘটে। অদ্বৈত বেদান্ত মতে মোক্ষ অবস্থা এক আনন্দ ঘন অবস্থা। সাংখ্য-যোগ দর্শন মতে মোক্ষ অবস্থা আনন্দঘন অবস্থা নয়। প্রাচীন মীমাংসক দের মতে স্বর্গসুখ ভোগ ঘটে। লাভই মোক্ষ এবং যোগ্যাদি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্বর্গসুখ

অদ্বৈত বেদান্ত মতে জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার বা ব্রহ্মের একাত্মতার উপলব্ধি মোক্ষ। রামানুজের মতে কর্ম-জ্ঞানের সংযোগে মোক্ষলাভ সম্ভব। চার্বাকদের মতে দেহজ ইন্দ্রিয় সুখই মানব জীবনের একমাত্র পুরুষার্থ। চার্বাক মতে মোক্ষ অবস্থা যদি হয় আত্যন্তিক দুঃখের নিবৃত্তি, তাহলে ঐ অবস্থা লাভ কেবলমাত্র মৃত্যুতেই সম্ভব।

13) What is the stage of Susupti, Turio And Mukti according to uponisad ?

A- **Susupti** :- সুষুপ্তি হলো স্বপ্নহীন গভীর নিদ্রাবস্থা। সুষুপ্তিতে বাহ্যজগৎ থাকে না আবার কল্পনা জগৎও থাকে না। এই অবস্থায় আত্মা তার স্বরূপে ক্ষণকাল অবস্থান করে। সুষুপ্তিতে আত্মা ~~ক্ষণকাল~~ কিছুক্ষণ ধরে চেতন রূপে প্রকাশিত হয় এবং সুষুপ্তি অবস্থা এক আনন্দময় অবস্থা। গভীর নিদ্রার বাহ্য জগৎ ও মনোজগৎ তিরোহিত হলেও চেতনার তিরোধান ঘটে না। গভীর নিদ্রা ভঙ্গের পর আমরা যখন বলি ঘুমটা বেশ ভালো হয়েছে, তখন আমাদের এই উক্তি এটাই নির্দেশ করে যে গভীর নিদ্রা অবস্থায় কিছু না থাকলেও চেতনা ছিল। তবে সুষুপ্তিতেও আত্মার স্ব-স্বরূপ পরিপূর্ণ ভাবে প্রকাশ পায় না। সুষুপ্তিতে আত্মার সৎ-চিৎ-আনন্দ রূপে অবস্থান ক্ষণকালীন অর্থাৎ অনিত্য। সুষুপ্তিতে আত্মা বিদ্যমান থাকলেও সেই আত্মাকে সঠিক অর্থে চেতন বলা চলে না। কাজেই সুষুপ্তিতে যে আত্মা অবস্থান করে তা আত্মার এক-বিমূর্ত অবস্থা মাত্র। যা শূন্যতারই নামান্তর।

Turiyo :- তুরীয় অবস্থা হলো শুদ্ধ চৈতন্য রূপে আত্মার স্ব-স্বরূপে অবস্থান। পরিপূর্ণ সচ্চিদানন্দ রূপে অবস্থান। এই অবস্থায় জ্ঞানের বিনাশ হওয়ায় আত্মা পূর্ণ আনন্দে বিরাজ করে। এই অবস্থায় আত্মা পূর্ণ জ্যোতি জ্ঞান স্বরূপে উদ্ভাসিত হয়, যেখানে জ্ঞাতা ও জ্ঞানের বিষয়ের ভেদ বিলুপ্ত হয়। তুরীয় অবস্থার এই আত্মাই স্বয়ং সৎ, স্বয়ং সিদ্ধ, সমস্ত জ্ঞান ও জগতের উৎস মূল। এই পরম সৎ আত্মা অবাচ্য, অনির্দেশ্য- জাগতিক ভাষায় প্রকাশ যোগ্য নয়; সমাধিস্থ হয়ে এই তুরীয় অবস্থার আত্মাকে সাক্ষাৎ ভাবে উপলব্ধি করা গেলেও শব্দের মাধ্যমে বা ভাষার মাধ্যমে তার স্বরূপ বর্ণনা করা যায় না। তুরীয় অবস্থার আত্মাকে ~~সাক্ষাৎ ভাবে উপলব্ধি~~ 'অমাত্র' বলা হয়।

তুরীয় অবস্থা আত্মার 'অমাত্র' অবস্থা। যা 'মাত্র' অর্থাৎ খণ্ডিত বা সীমিত, তাহার মাত্রা. তার বর্ণনা সম্ভব হলেও যা অমাত্র তার বর্ণনা সম্ভব নয়।

Mukti :- জীবের জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবর্তিত হওয়াকে উপনিষদে সংসার বলা হয়েছে। আর এই অবস্থা থেকে আত্যন্তিক অব্যাহতি পাওয়াকে মুক্তি বলা হয়েছে। জীব-জগৎ কে অর্থাৎ এই সংসারকে দুঃখ-কষ্ট, রোগ-শোক, জন্ম-মৃত্যু জর্জরিত দেখে উপনিষদের ঋষিরা ব্যথিত হয়েছেন এবং জীবের দুঃখ মুক্তির জন্যই তারা তত্ত্ব চিন্তার, সত্য জ্ঞানের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হয়েছেন। এই সংসারকে প্রকৃত ও নৈতিক অমঙ্গলের কবল থেকে মুক্ত করার তাগিদে উপনিষদের মুনি ঋষিরা দর্শন চিন্তায় প্রবৃত্ত হয়েছেন।

Imp

14) Why are the carvaka philosopers called Hedonist

চার্বাকদের কেন সুখবাদ বলা হয় :- চার্বাকদের মতে বর্তমান সুখই বাস্তব সত্য। তাই ভবিষ্যতের না পাওয়া অনিশ্চিত সুখের আশায় বর্তমানের সুখকে পরিত্যাগ করা উচিত নয়। মিথ্যা পরকালের সুখের আশায় কেবল মূর্খরাই বর্তমানে সুখকে অবহেলা করে। চার্বাকরা বলেন, আগামিকাল থেকে পাওয়া এমন এক কমনীয় ময়ূরের তুলনায় তোমার আয়ত্তে থাকা একটি কপোত অনেক বেশি মূল্যবান। কেননা অতীত তোমার নয়, ভবিষ্যৎ নিশ্চয়যোগ্য নয়, বর্তমানই কেবল প্রত্যক্ষগোচর। চার্বাক সুখবাদের মূল কথা হলো বা চার্বাকদের নৈতিক উপদেশ হলো — " যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ "। অর্থাৎ যতদিন বাঁচবে সুখে বেঁচে থাকো,

প্রয়োজনে ঋণ করেও ঘী ও সুখীকর পানীয় পান করো। চার্বাকদের এই প্রকার নৈতিক মতবাদ সুখবাদ নামে পরিচিত।

15) What is pratitya samutpadavada ?

Ans- প্রতীত্য সমুৎপাদ :— প্রতীত্য সমুৎপাদ বলতে বোঝায় অধীন ভাবে কোনকিছু উৎপন্ন হওয়া। বৌদ্ধ দর্শনে কার্যকারণ তত্ত্বকে প্রতীত্য সমুৎপাদ নীতির দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। 'প্রতীত্য' শব্দটির অর্থ হলো প্রাপ্ত হওয়া এবং 'সমুৎপাদ' শব্দটির অর্থ হলো উদ্ভব বা উৎপত্তি। অর্থাৎ প্রতীত্য সমুৎপাদ নীতিকে অনুযায়ী কোন কিছুকে প্রাপ্ত হয়ে বা অবলম্বন করে অপর বস্তুর উদ্ভব হয়। প্রতীত্য সমুৎপাদ নিয়ম অনুসারে কারণকে অনুসরণ করেই কার্য উৎপন্ন হয়। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় বীজ থেকে অঙ্কুর, অঙ্কুর থেকে কান্ড, কান্ড থেকে শাখা, প্রশাখা থেকে এবং শাখা প্রশাখা থেকে ফুল ও ফল উৎপন্ন হয়। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই ভিন্ন ভিন্ন কার্য কারণ ভাব থাকে এবং এ কার্যকারণ ভাব ছাড়া কার্যের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করা যায় না।

প্রতীত্যসমুৎপাদ যদৃচ্ছাবাদ, নিয়তিবাদ ও স্বভাববাদের বিরোধী। এই মতবাদ যুক্তি মতো বা আকস্মিকভাবে কোন কিছু বিশ্বাস করে না। এই মতবাদ অনুযায়ী কার্যের উৎপত্তির মূলে থাকে কোন প্রাকৃতিক নিয়ম। বৌদ্ধ মতে এই নীতি দৈহিক ও মানসিক সকল প্রকার সংস্কৃত ধর্মের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তবে কোনো অসংস্কৃত ধর্মের ক্ষেত্রে এই নীতি প্রযোজ্য নয়।

16) Explain the theory of momentariness following buddhay philosopy ? (6+)

→ ক্ষণিকত্ববাদ :- ক্ষণিকত্ববাদ অনুসারে জগতের প্রতিটি বস্তু এক ক্ষণের জন্য স্থায়ী, কোন বস্তু এক ক্ষণের বেশি থাকে না। কালের অবিভাজ্য ক্ষুদ্রতম অংশই হচ্ছে ক্ষণ। সংসার চক্রে পরিবর্তন প্রবাহে প্রতিক্ষণে উৎপন্ন প্রতি ব্যক্তিকেও তাই বৌদ্ধগণ ক্ষণ বলেন। এই ক্ষণই হল সত্য। ক্ষণের অতিরিক্ত কোন বস্তু নেই এবং এই ক্ষণকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। বিভিন্ন ক্ষণের পরম্পরাকে আমরা অবিদ্যাবশত স্থির দ্রব্যরূপে প্রত্যক্ষ করি। প্রথম ক্ষণের বস্তু দ্বিতীয় ক্ষণে থাকে না। প্রতিটি ক্ষণের বস্তু পরক্ষণের বস্তুকে উৎপন্ন করেই বিনষ্ট হয়। কোন বস্তুরই পুনরাবৃত্তি হয় না - প্রতিক্ষণে জগতের প্রতিটি বস্তু নবীন রূপ গ্রহণ করে। কোন দুটি ক্ষণের ঐক্যতা ..., কোন দুটি ক্ষণের বস্তু সত্ত্ব এক নয় - তারা দেখতে এক হলেও অভিন্ন নয়।

ব্যবহারিক জীবনে আমরা যে সকল বস্তুকে দেখি তাদেরকে অনেককে আমরা স্থায়ী বলে মনে করি। এমনকি পাহাড় আমাদের কাছে স্থির নিশ্চল বলে মনে হয়। বৌদ্ধ মতে আমাদের এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত এবং অবিদ্যা প্রসূত। জগতের কোন কিছুই স্থির বা নিশ্চল নয়। স্থির ও নিশ্চল রূপে প্রতিভাত বস্তু অসংখ্য সাদৃশ্য ক্ষণিক অবস্থার প্রবাহ মাত্র। ব্যবহারিক জীবনে আমরা প্রবহমান কালকে বছর, মাস, দিন, ঘন্টা, মিনিট প্রভৃতিতে ভাগ করি। এইসব ভাগ কল্পনা ও পরিমাপের যোগ্য। কিন্তু আমরা কালের এমন একটি অবিভাজ্য ক্ষুদ্রতম ভাগের কথা চিন্তা করতে পারি যা লৌকিক ভাবে পরিমেয় নয়। কালের এইরূপ

একটি ভাবকেই ক্ষণ বলে, বৌদ্ধ মতে জাগতিক বস্তু প্রতিক্ষণে পরিবর্তিত হয় এবং কোন বস্তুই এক ক্ষণের অধিককাল স্থায়ী হয় না। এই মতবাদই ক্ষণিকবাদ নামে পরিচিত।

17) What is the Significance of the Sentence "Artha Kriya Karitva Lakhanam Sat"? (3)

A. অর্থ ক্রিয়া কারিত্ব :- বৌদ্ধ মতে " অর্থক্রিয়াকারিত্বং লক্ষণং সৎ"। অর্থাৎ 'সৎ' এর লক্ষণ হলো অর্থ ক্রিয়াকারিত্ব। অর্থক্রিয়াকারিত্বের অর্থ কার্যোৎপাদনসামর্থ্যত্ব। অর্থাৎ কার্য উৎপাদনের সামর্থ্যযুক্ত হওয়াকে বলে অর্থক্রিয়াকারী হওয়া। যা সৎ তাই অর্থক্রিয়াকারী। যেমন - ঘট পটাদি বস্তু। অপরদিকে অসৎ বস্তু কখনই অর্থক্রিয়াকারী হয় না। যেমন বন্ধ্যাপুত্র। বন্ধ্যাপুত্রের কোন কার্য উৎপাদনের সামর্থ নেই। এই কারনে বৌদ্ধগন অর্থক্রিয়াকারিত্ব বা অর্থক্রিয়া সাধনের শক্তিকেই সত্তা বলেছেন।

বৌদ্ধমতে, অর্থক্রিয়াকারিত্ব সম্পন্ন বস্তু ক্ষণিক। কোন স্থায়ী বস্তুর অর্থক্রিয়াকারিত্ব নেই। একমাত্র ক্ষণিক বস্তু অর্থক্রিয়াকারী এবং যা অর্থক্রিয়াকারী তাই সৎ। সুতরাং দেখা যায় যে; বৌদ্ধ অভিমত সত্তার লক্ষণ থেকেই সৎ বস্তুর ক্ষণিকত্ব নিঃসৃত হয়।

18) What is the meaning of the term Advaita ? Why is Samkara's philosophy called Advaita ?

A. অদ্বৈতবাদ :- যে মতবাদ অনুসারে সত্তা (পরমতত্ত্ব) এক ও অদ্বিতীয় সেই মতবাদকে বলা হয় অদ্বৈতবাদ। উপনিষদীয় তত্ত্ব চিন্তার মধ্যে থেকেই অদ্বৈতবাদী চিন্তার আবির্ভাব ঘটে। বিভিন্ন উপনিষদে যে ব্রহ্ম অবিনেতি তত্ত্বের উল্লেখ করা হয়েছে, নানা বিশ্লেষণের মাধ্যমে অদ্বৈত বেদান্তিগন একথাই প্রতিষ্ঠা করেন। অদ্বৈতবাদীরা নির্গুণ ব্রহ্ম বা শুদ্ধ চৈতন্যকে একমাত্র সত্য মনে জগৎকে মিথ্যা মনে জীবাত্মাকে পরমাত্মা মনে এবং জ্ঞানকে মুক্তির উপায় মনে গ্রহণ করেন। শংকরাচার্যই অদ্বৈতবাদের প্রধান প্রবর্তক ও প্রচারক। এজন্যই শংকরের মতবাদকে অদ্বৈতবাদ বলা হয়।

19) Why is the Existence of god not admitted by the Carvakas ?

A. চার্বাক সম্প্রদায় তাদের জড়বাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ঈশ্বর পরলোক প্রভৃতি সম্পর্কে প্রচলিত বৈদিক ধারনার সরাসরি বিরোধিতা করেছেন। চার্বাকদের মতে ঈশ্বরের ধারনা পুরোহিতদের দ্বারা সৃষ্ট। জগৎ সৃষ্টির ব্যাপারে ক্ষিতি, অপ, তেজ, ও মরুৎ এই চারটি জড় পদার্থই যথেষ্ট। মৃত্যুতেই যেহেতু জীবের পরিসমাপ্তি সেহেতু পরলোক বা জন্মান্তরের কোন প্রশ্নই থাকতে পারে না। পরলোকে সুখভোগের কথা দুষ্ট পুরোহিতরাই কল্পনা করেছেন।

চার্বাকেরা নিরীশ্বরবাদী। প্রত্যক্ষের বিষয় নয় বলে চার্বাকেরা ঈশ্বরের সত্তা স্বীকার করেন না।

দুঃখ, কষ্ট, জড়প্রকৃতি জগতের কারন রূপে অসীম করুনাময় ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানা যায় না। সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, অসীম করুনাময় ঈশ্বর নিছক কল্পনা মাত্র। জগৎ সৃষ্টির ব্যাপারে ঈশ্বরকে কারন রূপে স্বীকার করার কোন প্রয়োজন নেই। ভূত চতুষ্টয় নিজ নিজ স্বভাব বশেই পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন। চার্বাকেরা দেশের রাজাকেই ঈশ্বর বলেন কেননা ঈশ্বরকে অর্পিত অনেক গুন রাজার মধ্যেই আছে। রাজা দেশের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিমান পুরুষ। রাজাকে তুষ্ট করলে প্রজা সুখ শান্তি লাভ করে অর্থাৎ স্বর্গ সুখ পায়। রাজাকে অসন্তুষ্ট করলে প্রজা অনেক দুর্গতি হয় অর্থাৎ নরক ভোগ করে।

20) What are Called panchaskandha ?

A. বৌদ্ধগন জীবকে পাঁচটি অংশ বা উপাদানের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেছেন। এই অংশ বা উপাদানগুলি স্কন্ধ নামে পরিচিত। প্রতিটি জীব এই পাঁচটি স্কন্ধের সমষ্টি বা সমাহার। এই পাঁচটি স্কন্ধ হল (i) রূপ, (ii) বেদনা (iii) সংজ্ঞা (iv) সংস্কার ও (v) বিজ্ঞান।

(i) রূপস্কন্ধ :- ক্ষিতি (মাটি), অপ্ (জল), তেজ ও মরুৎ (বায়ু) এই চারটি ভূতে গঠিত জড় দেহ হল রূপ স্কন্ধ।

(ii) বেদনাস্কন্ধ :- সুখ, দুঃখ প্রভৃতি হল বেদনা স্কন্ধ।

(iii) সংজ্ঞা স্কন্ধ :- বিষয়ের প্রত্যক্ষজ্ঞান হলে সংজ্ঞাস্কন্ধ।

(iv) সংস্কার স্কন্ধ :- মানসিক প্রবণতা সংশ্লেষাত্মক ক্রিয়া দৈহিক ক্রিয়া প্রভৃতি হল সংস্কার স্কন্ধ।

(v) বিজ্ঞান স্কন্ধ :- বিষয়বুদ্ধি বা চেতনা হলো বিজ্ঞান স্কন্ধ।

এই পাঁচটি স্কন্ধকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। যথা - নাম এবং রূপ, দৈহিক উপাদান বা অবস্থানগুলিকে রূপ এবং মানসিক উপাদানগুলিকে নাম বলা হয়। ভৌতিক-দেহ রূপের এবং বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান নাম এর অন্তর্ভুক্ত।

২১) বৈশেষিক মতে অভাব পদার্থের শ্রেণীবিভাগগুলি আলোচনা কর।

A. অভাব :- ন্যায় বৈশেষিক মতে অভাব অস্তিত্বের মতই একটি বাস্তব তত্ত্ব। অভাব কথাটির অর্থ হলো কোনকিছুর অস্তিত্বহীনতা। কোন অস্তিত্বশীল বস্তু যেমন আমাদের প্রত্যক্ষ বিষয় হয় তেমনি কোন বস্তুর অভাবও বাস্তব ঘটনা হিসাবে প্রত্যক্ষের বিষয় হয়। টেবিলে বই নেই — একথা বললে আমরা যেমন টেবিলের অস্তিত্ব অনুভব করি তেমনি বইয়ের অভাবও অনুভব করি। কাজেই স্বীকার করতে হয় যে, বই টেবিল প্রভৃতি যেমন পদার্থ রূপে গন্য হয় তেমনি টেবিলের অভাব, বইয়ের অভাব প্রভৃতিও আলাদা পদার্থ রূপে গন্য হয়।

বিশ্বনাথের মতে অভাব প্রধানত দুই প্রকার, যথা — (i) সংসর্গাভাব ও (ii) অন্যোন্যাভাব। সংসর্গাভাব আবার তিন প্রকার। যথা — প্রাগভাব

ধ্বংসাভাব ও

অত্যন্তাভাব

অতএব বৈশেষিক মতে অভাব পদার্থ চার প্রকার।

এগুলি হলো — (i) প্রাগভাব (ii) ধ্বংসাভাব

(iii) অত্যন্তাভাব (iv) অন্যোন্যাভাব

(i) প্রাগভাব :- কোন একটি বস্তু উৎপন্ন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তার যে অভাব থাকে তাকে প্রাগভাব বলে। যে ঘটটি কখনো উৎপন্ন হয়নি জগতে সেই ঘটের অভাব আছে। যে মুহূর্তে ঘটটি উৎপন্ন হয় সেই মুহূর্তে ওই ঘটের অভাব লোপ হয়ে যায়। বস্তুর এইরূপ অভাবকে প্রাগভাব বলে। এই অভাব হলো অনাদি ও সান্ত (লোপ) এই অভাব স্বীকার না করলে বস্তুর উৎপত্তি ব্যাখ্যা করা যায় না। এই অভাবের জন্যই যাবতীয় নতুন পদার্থের উৎপত্তি সম্ভব।

(ii) ধ্বংসাভাব :- কোন একটি জিনিস ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর তার যে অভাব শুরু হয়, তাকে ধ্বংসাভাব বলে। কোন ব্যক্তির মৃত্যুর সাথে সাথে ওই ব্যক্তির যে অভাব শুরু হয় তাই হলো ধ্বংসাভাব। এই অভাবের আদি আছে কিন্তু লোপ নেই। এই অভাবকে স্বীকার না করলে বস্তুর ধ্বংসকে ব্যাখ্যা করা যাবে না।

(iii) অত্যন্তাভাব :- কোন একটি জিনিসে অন্য কোন একটি জিনিসের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বা ত্রৈকালীন বা চিরকালীন যে অভাব থাকে তাকে অত্যন্তাভাব বলে। এই অভাব হলো নিত্য, অনাদি ও অনন্ত। যেমন - বায়ুতে রূপের অভাব হলো অত্যন্তাভাব, কেননা বায়ুতে রূপ কখনো ছিল না আবার কখনো থাকবে না।

(iv) অন্যোন্যাভাব :- দুটি ভাব পদার্থের মধ্যে যে পারস্পরিক অভাব থাকে তাকে অন্যোন্যাভাব বলে। যেমন- মানুষ ও পশুর মধ্যে অন্যোন্য ভাব আছে। মানুষ ও পশুর মধ্যে যে ভিন্নতা তা কবে সৃষ্টি হয়েছে তা বলা যাবে না আবার কবে শেষ হবে তাও বলা যাবে না। তাই এই অভাব হলো অনাদি, অনন্ত ও নিত্য পদার্থ। এই অভাবের জন্যই বিভিন্ন পদার্থের মধ্যে পার্থক্য বলা যায়।

২৯) বুদ্ধের চারটি আর্যসত্য ব্যাখ্যা করো। এগুলির মহত্ত্ব কি?

A- বুদ্ধদেব বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে জগৎ ও জীবনকে দেখেছিলেন। তিনি দেখেছিলেন মানুষের দুঃখ পরিপূর্ণ। তিনি বুঝেছিলে দুঃখ নিবৃত্তিই মানুষের প্রধান সমস্যা। বুদ্ধদেব গভীর তপস্যার দ্বারা এক মহান সত্য জ্ঞান লাভ করেন। যা বৌদ্ধ দর্শনে আর্যসত্য নামে পরিচিত। আর্যসত্যগুলি হল — (i) দুঃখ আছে, (ii) দুঃখের কারণ আছে, বা দুঃখ সমুদয়; (iii) দুঃখের নিবৃত্তি আছে বা দুঃখ নিরোধ, (iv) দুঃখ নিবৃত্তির উপায় আছে বা দুঃখ নিরোধ মার্গ।

(i) দুঃখ আছে :- এই জগতে সবই দুঃখময়, অর্থাৎ 'সর্বং দুঃখম্'। জন্ম, রোগ, মরণ, শোক, ক্লেশ, আকাঙ্ক্ষা, অপ্রিয় সংযোগ, প্রিয় বিচ্ছেদ, যা ইচ্ছা করে কিছু লাভ করা যায় না - তাই দুঃখ। সংক্ষেপে বলা যায় যে, যা কিছু আসক্তিপ্রসূত তাই দুঃখময়,

মৃত্যুর কবল থেকে মানুষ নিজেকে কিছুতেই রক্ষা করতে পারে না। মানুষের কামনাই বাসনা সৃষ্টি করে এবং এই কামনার অপরিপূর্ণতাই মানুষের মনে দুঃখ উৎপন্ন করে। বুদ্ধদেব নিজে মুখেই শিষ্যদের বলেছেন যে,— " যখন তোমরা প্রিয়জনের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছ, প্রিয়জনের থেকে বিযুক্ত হয়েছ, জন্ম থেকে মৃত্যু এবং মৃত্যু থেকে জন্মে ছুটোছুটি করে বেড়িয়েছ তখন তোমাদের এই সুদীর্ঘ পথে চারটি বিরাট সাগরেতে না জল আছে, তার চেয়ে বেশি চোখের জল তোমরা ফেলেছ"। সংক্ষেপে বলা যায় এই সংসার দুঃখময়। কোথাও সুখ নেই, কোথাও আনন্দ নেই, এই হল বুদ্ধদেব প্রচারিত প্রথম আর্যসত্যের মূল কথা।

(iii) দুঃখ নিরোধ বা দুঃখের নিবৃত্তি আছে :- বৌদ্ধদর্শনের তৃতীয় আর্যসত্য হল দুঃখ নিরোধ- যেহেতু প্রতিটি কার্যেরই কারন আছে, সেহেতু দুঃখেরও কতগুলি কারন আছে। যে কারনে দুঃখ জীবের জীবনে প্রবেশ করতে পারে সে ধ্বংস করতে পারলেই দুঃখের নিবৃত্তি হবে। দুঃখ নিবৃত্তির অবস্থাকে বৌদ্ধ দর্শনে নির্বাণ বলা হয়। নির্বাণ হল দুঃখ থেকে চিরমুক্তি। সংযোম সহকারে মানুষ তত্ত্ব জ্ঞানের দ্বারা এবং ইন্দ্রিয়কে সম্পূর্ণভাবে বশীভূত করে নিজের প্রচেষ্টায় নির্বাণ লাভ করতে পারে। ভোগ্য বস্তুকে ভোগ করার ~~মত~~ আকাঙ্ক্ষা যখন দূরীভূত হয় এবং বিষয়ের প্রতি আর আসক্তি থাকে না তখনি মানুষের পুনর্জন্ম হয় না। তখনই সে সংসার চক্র থেকে মুক্ত হয় এবং স্বাধীন ব্যক্তি নামে অভিহিত ~~হয়েছে~~ হন। এই ভাবে যে ব্যক্তি দুঃখ থেকে চিরমুক্তি লাভ করে তাকেই বলা হয় পূজনীয়

অর্থাৎ । বুদ্ধদেব অসংখ্য ভিক্ষুর লোককে মুক্তির বাণী শুনিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন নির্বাণ নিষ্ক্রিয় অবস্থায় শূন্য থাকে না ।

-on & explain each of them. 12

12/6

⇒ অলৌকিক প্রত্যক্ষ (Extraordinary perception): বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ যখন লৌকিকভাবে হয় না তখন সেই প্রত্যক্ষকে অলৌকিক প্রত্যক্ষ বলা হয়। অলৌকিক প্রত্যক্ষ ন্যায়মতে তিন প্রকার। যথা- (i) সামান্যলক্ষণ প্রত্যক্ষ (ii) জ্ঞানলক্ষণ প্রত্যক্ষ (iii) যোগজলক্ষণ প্রত্যক্ষ।

(i) সামান্যলক্ষণ প্রত্যক্ষ: যে প্রত্যক্ষে কোন জাতির অন্তর্ভুক্ত একটি বস্তু বা ব্যক্তির লৌকিক প্রত্যক্ষ থেকে, সেই জাতির সামান্য ধর্মের প্রত্যক্ষের ভিত্তিতে সেই জাতির অন্তর্ভুক্ত সব ব্যক্তি বা বস্তুর প্রত্যক্ষ হয়, তাকে সামান্যলক্ষণ প্রত্যক্ষ বলে। যে গুণ বা ধর্ম কোন একটি জাতির অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তির মধ্যেই বর্তমান থাকে এবং যে ধর্ম বা গুণের উপস্থিতির জন্য কোন জাতিকে অন্য জাতি থেকে পৃথক করা সম্ভব হয় তাকেই সামান্য ধর্ম বলে। যেমন- 'মনুষ্য' একটি জাতি, এই জাতির সামান্য ধর্ম হল মনুষ্যত্ব।

এই মনুষ্যত্ব সামান্য জাতির অন্তর্ভুক্ত। প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে বর্তমান। অনুরূপভাবে গরুর সামান্য ধর্ম হচ্ছে গোত্বর সামান্য ধর্ম গোত্ব, পশুর সামান্য ধর্ম পশুত্ব ইত্যাদি। অর্থাৎ জাতি বা এই জাতের প্রতিটি মানুষের মধ্যে প্রত্যেকটি মানুষের নানা বিষয়ে পার্থক্য থাকলেও, তাদের সকলের মধ্যে একই সামান্য ধর্ম, মনুষ্যত্ব বর্তমান। সেই কারণেই মানুষকে মনুষ্যত্বই আমরা তাকে মানুষ বলে চিনতে পারি। একটি মানুষকে প্রত্যক্ষ করার সময় তার সামান্য ধর্ম মনুষ্যত্বকে আমরা প্রত্যক্ষ করি। তাকে ~~তাকে~~ মানুষ বলে চিনি। সামান্য ধর্ম প্রত্যক্ষের মাধ্যমে মনুষ্যত্ব-বিশিষ্ট সকল মানুষের মধ্যে আমাদের একটি অলৌকিক সন্নিকর্ষ হয়। এই সন্নিকর্ষের ফলে সকল মানুষের সামান্যত: একটি অলৌকিক প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হয়। সামান্য ধর্মের দ্বারা যেহেতু এইরূপ অলৌকিক প্রত্যক্ষ সম্ভব হয়, সেহেতু এইরূপ অলৌকিক প্রত্যক্ষের নাম সামান্যলক্ষণ প্রত্যক্ষ।

(ii) **জ্ঞানলক্ষণ প্রত্যক্ষ** : আমাদের প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় আলাদা আলাদা। একটি ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় যদি অন্য একটি

~~ইন্দ্রিয়~~ ইন্দ্রিয় দ্বারা সম্পাদিত হয় তাহলে যে প্রত্যক্ষ হয় তাকে জ্ঞানলক্ষণ প্রত্যক্ষ বলে। যেমন- আমরা অনেক সময় বরফখণ্ড দেখে বলি তা ঠাণ্ডা, চন্দন কাঠটি দেখে বলি তা সুগন্ধিযুক্ত প্রশ্ন হল চক্ষু ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমাদের এই জ্ঞান কি করে হয়? সাধারণভাবে ত্বক-ইন্দ্রিয় শৈত্য ও নাসিকা জ্ঞান ঘটাতে পারে না। অথচ এখানে আমরা বলছি যে, এগুলি আমরা চোখের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ করছি। এজাতীয় প্রত্যক্ষকে জ্ঞানলক্ষণ প্রত্যক্ষ বলা হয়। যেহেতু জ্ঞান-লক্ষণ প্রত্যক্ষ পূর্ব প্রত্যক্ষের উপর নির্ভরশীল। পূর্বে আমরা যখন স্পর্শের মাধ্যমে জেনেছি যে ~~বরফ~~ বরফ ঠাণ্ডা, এখন তার সঙ্গে বর্তমান প্রত্যক্ষই যুক্ত হল।

(iii) যোগজ প্রত্যক্ষ: যেসব যোগী যোগ অভ্যাসের দ্বারা অলৌকিক শক্তির অধিকারী হন তাদের পক্ষেই এই যোগজ প্রত্যক্ষ সম্ভব। যোগীরা অলৌকিক শক্তির অধিকারী হওয়ার জন্য বস্তুর অতীত এবং ভবিষ্যৎ, দূরবর্তী ও অতিসূক্ষ্ম বস্তু প্রত্যক্ষ করতে পারেন, যেগুলি সাধারণ মানুষের পক্ষে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব নয়। একেই যোগজ প্রত্যক্ষ বলা হয়।

যোগজ প্রত্যক্ষ দ্বিপ্রকার। যথা- যুক্ত, এবং যুঞ্জান। যে সব যোগী যোগসাধনায় সিদ্ধি লাভ করেছেন এবং ঈশ্বরের সঙ্গে সাযুজ্যলাভ করেছেন তারাই হলেন যুক্তযোগী। তাঁদের যোগজ অলৌকিক শক্তির প্রত্যক্ষ সর্বকালীন এবং স্বাভাবিক। এই সব যোগী সর্বজ্ঞ হয়েছেন। আর যুঞ্জান যোগী হলেন তারা যারা ঈশ্বরের সঙ্গে সাযুজ্য লাভের জন্য সাধনা এবং যারা যোগ সাধনায় সিদ্ধি লাভের পথে চলেছেন এই সব যোগী যোগাভ্যাসের অবস্থায় এখনও এখনও সাধকের অবস্থায় অবস্থান করেন নি। এরা কেবল বিষয়ের ধ্যান করলে সেই বিষয়ের নির্দিষ্ট যোগজ সন্নিকর্ষের দ্বারা সেই বিষয়ের অলৌকিক প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করে থাকেন।

উল্লেখযোগ্য যে, ভারতীয় দর্শনের সব সম্প্রদায় নৈয়ায়িকদের তিনপ্রকার অলৌকিক প্রত্যক্ষ স্বীকার করেন না। জৈন- সাংখ্য ও বেদান্ত দর্শনে কেবল যোগজ প্রত্যক্ষ স্বীকৃত। মীমাংসা দর্শনে যোগজ প্রত্যক্ষ অস্বীকৃত। আবার নব্যনৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি সামান্যলক্ষণ প্রত্যাসত্তি অস্বীকার করেছেন। কিন্তু ন্যায় বৈশেষিক মতে এই তিনপ্রকার অলৌকিক প্রত্যক্ষ স্বীকার করা হয়।

END